Vol. 1, Issue 239

সকালবেলা

বৃহস্পতিবার, ১০ মাঘ, ১৪১৯ ● ২৪ জানুয়ারি, ২০১৩

প্রদেশ ভবনে ঘুমের ঘোর

মাস খানেক আগেও মনে হচ্ছিল এবার রাজ্য বিধানসভা ভোটে জোর লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে হবে বামফ্রন্টকে। মহিলা কংগ্রেসের জমায়েত এবং যুব জমায়েতে সেই আভাস অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ২০০৮-এর ভোটে নিদারুণ পরাজয়ের পরও কংগ্রেস ঘরে বসে থাকেনি। পর্যায়ক্রমে নানা ইস্যুতে একের পর এক আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছে। বিগত পাঁচ বছরে কংগ্রেস, যুব কংগ্রেস, মহিলা কংগ্রেস, উপজাতি কংগ্রেস এবং এনএসইউআই এত সব ইস্যু নিয়ে ময়দানে দাপিয়েছে যে বলে যেন শেষ করা যায় না। সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কারণে যাদের জমি জিরেত বেড়ার ওপারে পড়েছে তাদের নিয়ে করা হয়েছে ভূমির দাবিতে আন্দোলন। গ্র্যাজুয়েট, পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট, বিএড বেকারদের আন্দোলন। কম্পিউটার ফ্যাকাল্টিদের আন্দোলন। ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন। এই সব আন্দোলনের তালিকা একেবারে ছোটখাটো নয়। ওদিকে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের উত্থান আন্দোলনে ওই রাজ্যের বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশের সরাসরি রাজনীতির বাজারে নেমে পড়ার ঢেউ ত্রিপুরার রাজনৈতিক হাটেও বেশ খানিকটা নাড়া দিয়েছিল। হঠাৎ করেই যেন এ রাজ্যের মানে আগরতলার কিছু লোকজন হয়ে উঠলেন বুদ্ধিজীবী এবং সরাসরি কংগ্রেসের পতাকাতলে শামিল না হলেও বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু এ রাজ্যের এই সব 'হঠাৎ বুদ্ধিজীবীদের' তোপ সেভাবে নাড়া দিল না জনমনে। এই তো শেষবারের মতো এই ক'দিন আগেই এই সব হঠাৎ বুদ্ধিজীবীরা শিবম হত্যা ইস্যুতে বামফ্রন্টের শাসনকে অপশাসন হিসেবে তুলে ধরার জন্য নেমেছিলেন রাস্তায়। কিন্তু ঢেউ উঠল না তাতে, আওয়াজও অতি ক্ষীণ। সম্ভবত এদের তোপের বারুদ ছিল ভেজা অথবা ভেজাল মিশ্রিত। দেখা গেল, পাঁচ বছরে কংগ্রেসিরা নিজেদের উপস্থিতি জাহির করতে চেষ্টার কোনও কসুর করেনি। কিন্তু এই যে দীর্ঘ আন্দোলন তালিকা এর ইস্যুগুলি হরেক কিসিমের। যেন হরেক মালের পসরা নিয়ে রাজনীতির হাটে নিরন্তর হেঁটে গিয়েছে ফেরিওয়ালা কংগ্রেস। সমস্যা দেখা দিল শেষ বেলায়। এতগুলি ইস্যুকে একটি সূত্রে গাঁথতে পারেনি প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। তাছাড়া আন্দোলনগুলি করা হয়েছে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে। কংগ্রেসের বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতারা পৃথক-পৃথকভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ফলে রামবাবু আন্দোলন করলে শ্যামবাবু তাতে যাননি। কিংবা যদুবাবু অনশন অবস্থানে বসলে মধুবাবু বাগড়া দিয়েছেন, পেছন থেকে কলকাঠি নেড়েছেন। চূড়ান্ত পর্যায়ে দেখা গেল, পাঁচ বছর ধরে আন্দোলনের পর আন্দোলন করে, আন্দোলনের ঘাস-বিচালি খাইয়ে ক্ষমতার দুগ্ধ দোহন করার জন্য যে গাভিটিকে বড় করে তোলা হল তার দখলদারি নিয়ে ক্ষমতা দখলের আগেই শুরু হয়ে গেল কংগ্রেসের বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতাদের মধ্যে কড়াকাড়ি। দুগ্ধ দোহনের জন্য বালতিও রাখা হল। কিন্তু দোহনের আগেই তাতে চনা বর্জনের কাজও শুরু করে দিলেন বিক্ষুব্ধ নেতারা। ভোটে দাঁড়াতে চেয়ে যারা টিকিট চেয়েছিলেন, শেষে কংগ্রেসের টিকিট না পেয়ে নির্দল হিসেবে মনোনয়ন পেশ করাও আরম্ভ হয়েছে। একদিকে দলত্যাগের হিড়িক, কংগ্রেস ছেড়ে সিপিএমে ভিড়ে যাওয়ার হিড়িক এবং অন্যদিকে কংগ্রেসিদের নির্দল হিসেবে দাঁড়ানোর হিড়িক যেন মড়কের দিকে ঠেলে দিচ্ছে প্রদেশ কংগ্রেসকে। প্রদেশ সভাপতি হাবুডুবু খাচ্ছেন। প্রার্থী তালিকা এখনও চূড়ান্ত করতে পারেননি। ঠান্ডা মাথায় মনোনয়ন জমা দিচ্ছেন বামফ্রন্টের প্রার্থীরা। জমা নেওয়া বেকার ভাতার ফর্মগুলি প্রদেশ কংগ্রেসের মতোই ঝিমুচ্ছে। পাঁচ বছর ধরে আন্দোলন করতে করতে ক্লান্ত কংগ্রেসের ঘুম পেয়েছে খুব—খুউব,খুবই।

গাহি তব জয়গাথা

● দু'রকমের ভক্ত আছে – বেড়ালছানা আর বাঁদরছানা, তাঁরই দেওয়া উদাহরণ। বাঁদরছানা দু'হাত দিয়ে মাকে জড়িয়ে থাকে, আর মা এক গাছ থেকে আর এক গাছে লাফিয়ে চলে। যতক্ষণ মাকে জড়িয়ে থাকে, আর মা এক গাছ থেকে অপর গাছে যায় ভয় নেই – কিন্তু মাকে ছাড়লেই বিপদ। কিন্তু বেড়ালছানার নিজের কোনও চেষ্টা নেই, নিজের ভালমন্দ নিয়ে তার কোনও ভাবনা নেই। মা যদি তাকে বাবুর বিছানায় রাখে – তাতেও সে খুশি। আবার যদি ছাইয়ের গাদায় রাখে – তাতেও সে খুশি। সে শুধু মিউ মিউ করে। ঠাকুরের সেই রকম। বলছেন, আমি কিছু জানি না, খাই-দাই আর মায়ের নাম করি। সব অবস্থায় পরিপূর্ণ শরণাগত। মা যা করেন, মা যা বলছেন।

● গুরুর জন্যে সাধকের ভাববার দরকার নেই যদি কারও ঠিক সাধনার দরকার হয় তিনি তার সদ্গুরু জুটিয়ে দেন।

● সিদ্ধি সিদ্ধি বলে চেঁচালে সিদ্ধির নেশা হবে না, সিদ্ধি এনে বেঁটে খেতে হবে তবে সিদ্ধির নেশা হবে। ঈশ্বর ঈশ্বর বলে চিৎকার করলে কী হবে? যে জিনিস লাভ করতে ইচ্ছা হবে সেইরকম সাধনা করতে হবে। নিয়মিত সাধনা করলে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের দর্শন মিলবে।

● ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের বাসস্থান। তিনি সর্বভূতে বিরাজিত বটে, তবে ভক্তহৃদয়ে তাঁর বিশেষ প্রকাশ। মন যেন সাদা কাপড়, যে রঙে ছাপানো যাবে সেই রঙেই রঞ্জিত হয়।

— শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ

কলেমার দাওয়াত

কুরবানি সমূহকে সর্বদা স্মরণ করে দেশের জনগণের তাকাজা পূরণ করতে হবে যখন আপনার এখানে কুরবানির মানও উঁচু হবে। আমরা সহজ সরল আসানীর সঙ্গে দাওয়াত একদমই দেব না। এই সহজ সরল কাজের মানকে একদম নিচে নামিয়ে দিয়েছে। দাওয়াত আর এজজাতের মধ্যে পার্থক্য অনেক, দাওয়াত হলো সম্পূর্ণ দাওয়াত যেমন নবী (সাঃ) দাওয়াত দিয়েছিলেন। সমবেতদের উপর আদেশ কী? যেমন জুম্মার নামাজ অথবা জামাতে নামাজ, যে সমস্ত লোক এই কাজে লেগে আছে, তাদের কাছে এই কাজ সমবেতদের আদেশ হওয়ার উদ্দেশ্য কী? হুযুর (স.) এর কাছে এক শাসক ছিল যারা হুযুর (সাঃ) এর সঙ্গে একত্রিভূতভাবে সংযুক্ত ছিল।

— মওলানা সা'আদ কান্ধলুবী মাদ্দাজিল্লাহুল আলি

বাইবেলের বাণী

● এসব কথা তোমাদেরকে বললাম, যেন তোমরা বাঁধা না পাও। লোকে তোমাদেরকে সমাজ থেকে বের করে দেবে; এমনকী, সময় আসছে, যখন যে কেউ তোমাদেরকে বধ করে, সে মনে করবে আমিই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উপাসনাবলি উৎসর্গ করলাম তারা এসব করবে, কারণ তারা না পিতাকে, না আমাকে জানতে পেরেছে।

— যোহন ১৬ঃ ১-৩

যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই !

সীমান্তের দু'পাশে থাকা সাধারণ মানুষের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে একটাই দাবি— অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় চাই না। চাই শুধু একটু শান্তি। নন্দলাল ভট্টাচার্য

বিশিষ্ট কবি শাহিদ লুধিয়ানভি একটা কবিতায় বলেছেন, যুদ্ধ নিজেই একটা বিরাট সমস্যা। সে আবার কোন সমস্যার সমাধান করবে? কবিতাটার বাংলা মর্মার্থ অনেকটা এই রকম—

তোমরা যারা দূর শহরে
দিব্য আছ স্বপ্ন ঘোরে
যুদ্ধ-যুদ্ধ চিৎকারেতে
বিষ বাঁশিতে ফুৎকারেতে
ভরিয়ে তোল বিশ্ব!
ভুলেও ভেবে দেখেছ কি
আমজনতার হবেটা কী
তোমাদের ওই রক্তখেলায়
জীবনেরই সকালবেলায়
তারাই হবে নিঃস্ব!

জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার ভারত-সীমান্তে পাক সেনারা হঠাৎ হামলা চালিয়ে নৃশংস নেকড়ের মতো এক ভারতীয় জওয়ানের মাথা কেটে নিয়ে যাওয়ার পর সহসা সমস্ত পরিবেশটাই গিয়েছে বদলে। সেটাই স্বাভাবিক। পাকিস্তান যা করেছে বা করছে, মানুষের ইতিহাসে তা জঘন্যতম অপরাধ বলেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে। কিন্তু এই ঘটনা নিয়ে দু'দেশেরই রাজনৈতিক প্রভুরা যে ধরনের হুঙ্কার দিচ্ছেন তাতে কিন্তু ঘটনাটার আসল গুরুত্বটাই কমে যাচ্ছে অনেকটা। সোনিয়া গান্ধী থেকে রাহুল গান্ধী বা প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ছে ক্রোধের তীব্র লাভা। বিজেপি তো দু'পা এগিয়েই বলছে, যুদ্ধ—চাই যুদ্ধ। বিরোধী দলনেত্রী সুষমা স্বরাজের হুঙ্কার, পাকিস্তান যদি শহিদ বীর সৈনিক হেমরাজের ছিন্ন-শির ফেরত না দেয়, তা হলে ভারতের উচিত ওদের অন্তত ১০জনকে ছিন্নমুণ্ড করা।

অন্যদিকে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থায় যে ডামাডোল চলছে তাতেও তারাও অভ্যন্তরীণ সংকট থেকে রেহাই পাবার জন্য যুদ্ধকেই আঁকড়ে ধরতে চাইছে। অবশ্য এটাই তাদের চিরাচরিত কৌশল। মানুষ যখন চায় খাদ্য, তখনই সীমান্তে বাজে রণবাদ্য। মানুষের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য, ক্ষমতা হারানোর আবর্তে পড়ে উদ্ধার পাওয়ার সবচেয়ে সহজ রাস্তা হচ্ছে যুদ্ধ। জাতীয়তাবোধ সুড়সুড়ি দেওয়া। আর ওই ভাবেই ক্ষমতার মসনদে বেশ মৌজ করে বসা। পাক সুপ্রিম কোর্ট যখন পাক প্রধানমন্ত্রীকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিচ্ছে, দুর্নীতির অভিযোগে ক্ষমতাসীনদের অস্তিত্বই যখন বিপন্ন হয়ে উঠেছে— তখন ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করার পুরনো নীতিতেই ফিরে যেতে চাইছে পাকিস্তান। আর তাতেই সীমান্তের দু'পাশে থাকা সাধারণ মানুষ আজ উদ্বিগ্ন। আতঙ্কিতও। একটা অসহনীয় অবস্থায় মধ্যে পড়েছেন যুদ্ধবিরতি-রেখার দু'পাশে থাকা সাধারণ মানুষ। কোনও দেশে কোনও সমাজেই সাধারণ মানুষ যুদ্ধ চান না। বরং তাঁরা মনে করেন, ভাষা নয়, ধর্ম নয়, এমনকী নাগরিকত্বও নয়, তাঁদের সকলের একটাই পরিচয় তাঁরা মানুষ। মানুষ হিসেবে মানবিক সম্পর্কটা বজার রাখতে চান তাঁরা। তারা চাইলেও, রাজা যারা, শাসক যারা, তারা নিজেদের স্বার্থেই চায় যুদ্ধ। কেননা, যুদ্ধে তাদের ক্ষমতা ছাড়া হারাবার আর কিছুই থাকে না। তাদের রক্ত ঝরে না— প্রাণও যায় না প্রায়ই। আর খাবার চিন্তাটা করতে হয় না কোনও সময়ই। কিন্তু সাধারণ মানুষগুলির তো যুদ্ধের বিলাসিতায় নামার মন ও মেজাজ কোনওটাই থাকে না। তাদের আন্তরিক ইচ্ছা, মিলেমিশে খেয়ে-পরে হেসে খেলে বিধাতার দেওয়া দুঃখটাকেও সপাট ব্যঙ্গ করার। স্বভাবতই সীমান্তে যখনই বাজে যুদ্ধের দামামা, তখনই শঙ্কিত হয় তারা— রুজি হারাবার ভয়ে, স্বজন হারাবার আশঙ্কায়।

নিরাপদ দূরত্বে বসে যাঁরা যুদ্ধের কথা বলেন, তাঁরা কিন্তু কোনও কোনও সময়েই এই মানুষগুলির কথা ভাবেন না। শাসকদের কাছে যুদ্ধটা সব সময়ই একটা খেলা। সে খেলায় হারজিত দুটোই থাকতে পারে। এখন হার হতে পারে ভেবে তো খেলাটা বন্ধ করা যায় না। তার চেয়েও বড় কথা, কে হারবে, তাও তো আগের থেকে নির্দিষ্ট নয়। অতএব প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে নেমে পড় যুদ্ধে।

ভারত-পাক সাম্প্রতিক উত্তেজনার মুহূর্তেও সীমান্তের মানুষগুলি কিন্তু এখন থেকেই ভাবছেন। তাহলে কি আবার যেতে হবে আশ্রয় শিবিরে। আবার বিপন্ন হবে জীবন? আবার কি সাজিয়ে তুলতে হবে স্বজনের জন্য চিতা? এইসব ভাবনা ও শঙ্কার চেহারাটাই ফুটে উঠেছে একটি জাতীয় দৈনিকের সাম্প্রতিক এক নিবন্ধে।

ভারত-পাক নিয়ন্ত্রণ-রেখার দু'পাশে রয়েছে এমন অসংখ্য পরিবার, যাঁদের বাবা হয়তো রয়েছে ওপারে, মা এপারে। সন্তানরা একদিকে, মা-বাবা আর এক দিকে। স্বভাবতই তাঁরা শাসককে চেনেন না, চেনের রক্তের সম্পর্ককে। তাই বিচ্ছিন্ন হয়েও তাঁরা স্বপ্ন দেখেন আবার পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার। এক হওয়ার।

এবার পুঞ্চের যে অঞ্চলে হামলাটা হয়েছে, তারই অদূরে এক গ্রামে থাকেন এক বৃদ্ধা। ১৯৬৫-র যুদ্ধের সময় মা-মেয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে সীমানার দু'পাশে বাস করছেন। অনেক দিন, মাস, বছর পার করে এই গত জুলাইয়ে মা-মেয়ে আবার মিলল। হাসি-আবেগ, জড়িয়ে ধরা— কত না বলা জমিয়ে রাখা কথার চালাচালি। তার পর ৮৫ বছরের বৃদ্ধা মা বলেন, সবই হল, কিন্তু আমি এখন কিছুই দেখতে পাই না। এখন আমি অন্ধ। তাই সবই সূক্ষ্ম অনুভূতি।

তবুও ওই বৃদ্ধা মিলতে চান তাঁর ওপারের স্বজনদের সঙ্গে। চান যে বাসটা দুই সীমান্তের মানুষকে যুক্ত করে রেখেছিল, সেটা আবার চালু হোক। দুই দেশের সরকারের কাছেই তাঁর আবেদন, দয়া করে আমাদের যোগাযোগটা রাখতে দিন। মানবিক সম্পর্কটা একটু উষ্ণ হতে দিন। সীমান্তের দু'পারে থাকা আমাদের মতো মানুষ যাতে একটু শান্তিতে মরতে পারে, সেদিকে একটু নজর দিন। ক্ষমতায় আছেন যেসব প্রভু, তাঁদের কাছে এটাই একমাত্র প্রার্থনা।

সেই বাসটি এখন আর চলছে না। সীমান্তে গোলমাল শুরু হতে বন্ধ রয়েছে বাসটি। অথচ মানুষ দেখছে, ওই বাসের যাত্রীরা কীভাবে পরস্পরকে আনন্দে জড়িয়ে ধরে, কান্নায় গলা মেলায়। মানুষগুলো ভুলতে পারেনি তাদের শৈশব-কৈশোর অথবা যৌবনের সেই দেশকে। তাই ছেড়ে আসা গ্রাম থেকে কেউ যদি আসে তা হলে তারা তার কাছে চায়, কোনও বহুমূল্য উপহার নয়, চায় হয়তো সেই গাছটির কিছু শুকনো পাতা— যে গাছটি কোনও একসময় লাগিয়েছিল সে-ই। চায় তার সেই জন্মভূমির একমুঠো মাটি। যত্ন করে সিন্দুকে ভরে রাখে মাটি। বলে যায় উত্তরপুরুষদের কবর দেওয়ার সময় এই মাটি যেন দেওয়া হয় প্রথমে। এই মাটিতে লুকিয়ে আছে তাদের জীবনের শান্তি, মরণেরও।

সীমানার দু'পাশে থাকা অসংখ্য মানুষের একটাই দাবি— দু'দেশের সরকারের কাছেই, অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় চাই না— চাই শুধু একটু শান্তি। ওই শান্তিটুকু আপনারা দিতে পারেন না আমাদের! আর তাঁদের প্রার্থনা, পয়গম-ই-আমন নামে যে বাসটি দুই সীমান্তের বেড়া ডিঙিয়ে যাতায়াত করত, সেটি আবার চালু হোক।

পুঞ্চের যুদ্ধবিরতি রেখার দু'দিকে থাকা সাধারণ মানুষের এইসব আর্তি বেশিরভাগ সময়ই অশ্রুত থেকে যায় ক্ষমতার অলিন্দে যাঁদের বিচরণ তাঁদের কাছে। তাই অতি সহজেই যুদ্ধের কথা বলতে পারেন তাঁরা। আবেগে গলা ফাটাতে পারেন। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বক্তৃতাও দিতে পারেন। কিন্তু মানুষের মনের আসল খবরটা না রাখায় তাঁরা শুধু এদের নিয়ে খেলাই করেন। যুদ্ধবাজদের এই যুদ্ধ যুদ্ধ খেলাটা কবে বন্ধ হবে, তারই আশায় বুক বেঁধে রয়েছেন সীমান্ত অঞ্চলের এইসব মানুষজন। যে কোনও যুদ্ধের আগেই একবার কি ভাবা হবে না তাঁদের কথা? তাঁরাই— দেশের আসল সাহারা। তাঁদের কি শুধু বলিই দিয়ে যাওয়া হবে রাজনীতির ওই যূপকাষ্ঠে?

<u>ক্যাম্পাস বিট</u>

নবমে ছাত্র-ছাত্রীরা আটকে যাচ্ছে কেন?

গাইডের অভাবে পড়েনি ছাত্রছাত্রী

সমীর দাস

নবমে খারাপ ফলাফলের জন্য ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই দায়ী। বাড়িঘর থেকেও ভাল গাইড পায়নি। স্কুল থেকে তো সবাইকে পড়ার জন্য ডাক-চাপ দেওয়া হয়। কিন্তু বাড়িতেও এ ধরনের ডাক -চাপের প্রয়োজন আছে। যাদের ফলাফল খারাপ হয়েছে এখনই তাদের বুঝতে হবে পর্ষদ পরীক্ষার আগে পড়াশোনার গুরুত্ব। দেরি হলে ফলাফল আগের মতো হতে পারে। এ বছর আমি বার্ষিকে ৭৫০-তে ৬০৩ নম্বর পেয়েছি। অবশ্য অষ্টম থেকে নবম শ্রেণিতে উঠার সময় একই নম্বর পেয়েছিলাম। তাই বলতে পারছি না আগের থেকে কম পেয়েছি। তবে আমার বন্ধুদের অনেকেই এবার কম পেয়েছে। আবার কেউ কেউ আটকে গিয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের মনে নিজে থেকে পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে হবে। এর জন্য থাকছে মা-বাবার দেখাশোনা। স্কুলে প্রত্যেককে আলাদা গাইড করা সম্ভব নয়। তাই বাড়িঘর থেকে গাইড পেতে হবে। আর অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত যে এখন ফেল নেই তা ঠিক নয়। শূন্য পেয়ে পাশ করা তো মূল্যহীন। অনেকেরই মনোবৃত্তি তাই না পড়ে পাশ করে যাওয়া। আমার মনে এটা কখনও আসেনি। অন্যদেরও বলব এসব মনে না আনতে।

সমীর আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র স্মৃতি বিদ্যামন্দিরের দশম শ্রেণির ছাত্র।
শ্রুতিলিখন ঃ সমীরণ মজুমদার

চিঠি লিখলেই পুরস্কার

আমাদের কাগজের বয়স বেশি নয়। তবুও যা চিঠি আসছে, উৎসাহব্যঞ্জক। আরও চিঠি চাই। ভাল চিঠি চাই। উৎসাহ দিতে আমরা পুরস্কৃত করব পাঠককে। প্রতি সপ্তাহে ভাল চিঠির লেখক- লেখিকাকে আমরা ৪০০ টাকা দেব। ভাল চিঠি পাঠান। যোগ্য বিবেচিত হলেই পুরস্কার মিলবে।

সম্পাদক

সৌরবিদ্যুৎ ঃ উপযোগিতার পাশে উদ্বেগ অপচয়ে

সৌর বিদ্যুৎ কি সত্যিই বিকল্প হয়ে উঠছে নাকি শুধুমাত্র সহায়ক শক্তি? রাজ্যের কয়েকটি অঞ্চল ও গুচ্ছগ্রামের সীমায়িত সৌর বিদ্যুতের প্ল্যান্ট ঘুরে এসে লিখেছেন সুমন ভট্টাচার্য।

বিশ্ব জুড়ে লক্ষ-কোটি শিল্প-কল- কারখানা থেকে উপজাত গ্যাস-ধোঁয়া, বৈদ্যুতিক ভোগ্য পণ্যের লক্ষ লক্ষ উপাদানের বেহিসাবি ব্যবহার এবং একই সঙ্গে বন ধ্বংসের কারণে বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাস, বিশেষত কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ঘন আস্তরণ ভূউষ্ণায়ন ও আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রধান ও একমাত্র কারণ। প্রধানত কার্বনের যথেচ্ছ নির্গমন ঠেকাতে বিশ্বজুড়ে প্রয়োগ শুরু হয়েছে অপ্রথাগত শক্তির ব্যবহারের। যার অন্যতম হল সৌরশক্তির ব্যবহার। কিন্তু কতটা বাস্তবিক সম্ভাবনা আছে সৌর শক্তির বিদ্যুতের?

চোখের সামনেই 'ঝুপ' করে আলো নিভে চারদিকে ছেয়ে গেল গভীর আঁধার। অন্ধকার ফুঁড়ে মুহূর্তে জ্বলে উঠতে লাগল সৌরশক্তির একেকটি বাতি, গুনে দেখা হয়নি। কিন্তু গোটা সবজি বাজারেই ক্ষণিকের অন্ধকার আর নেই। খোয়াই জেলা সদর সুভাষ পার্ক এলাকার বাজার। একশোজন স্থায়ী সবজি ব্যবসায়ী নগর পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে এই বাজারে পাকাপাকি ব্যবসা করছেন। মাসে ৬০ টাকা করে দিতে হয় ভাড়া বাবদ। বাকি আর সবই বিনা খরচে। প্রচলিত বিদ্যুৎ তো বটেই অপ্রচলিত সৌরশক্তির আলোর জন্যও কোন খরচ নেই। ২০০৩ সালে স্থায়ী বাজার শেডের উদ্বোধনের সময় থেকেই একযোগে প্রচলিত ও অপ্রচলিত বিদ্যুৎ শক্তির লাইন বসানো হয়। বাজারের মূল সময়ে যাতে কোনওভাবেই আলো না যায় নগর পঞ্চায়েত থেকে ট্রেডার মাধ্যমে ব্যাপক ভরতুকিতে ১,৩২,০০০ টাকা মূল্যের ডমেস্টিক লাইটিং সিস্টেমে ১১টি সৌরশক্তির প্যানেল ইউনিট বসানো হয়। লোডশেডিং হলেই প্রতিটি ইউনিটে দুটো করে মোট ২২টি আলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে জ্বলে ওঠে। সবজি ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারি চন্দন সূত্রধর ক্রেতাদের দরদাম কেনা-বেচার ফাঁকে ফাঁকে জানাতে থাকলেন, চল্লিশজন গৃহস্থ ও দৈনিক ২ টাকা হিসেবে এই বাজার শেডে ভাড়া দিয়ে ব্যবসা করেন। স্থায়ীভাবে মাসে ৬০ টাকা করে ভাড়ার ২০ জন কলা ব্যবসায়ী ও ২০ জন পান ব্যবসায়ীও ঠাঁই নিয়েছেন। এছাড়া অতিরিক্ত ২০ জনের দৈনিক ২ টাকা হারে ভাড়া দিয়ে এই শেডে ব্যবসা করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে নগর পঞ্চায়েত থেকে। একটা হিসেব পাওয়ার চেষ্টা চলছিল এই ১১ ইউনিট সৌরশক্তির আলো কতটা প্রচলিত শক্তি বাঁচাতে পারে? খোয়াই নগর পঞ্চায়েতের এই প্রকল্পে ট্রেডার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী সঞ্জীব ভট্টাচার্যের কাছে জানা গেল, ১৮ ওয়াট করে প্রতিটি সিএফএল হিসেব করলে দাঁড়ায় মোট ৩৯৬ ওয়াট সৌর বিদ্যুৎ। প্রতিদিন দেড় ঘণ্টা হিসেবে সারা মাসে ১০৯৬.২ ইউনিট প্রচলিত শক্তি বাঁচাতে পারে কমাতে পারে বছরে, ২৯৭০ কেজি কার্বন-ডাই অক্সাইড সংযোজন। দশ বছর ধরে ছোটখাটো মেরামতির সমস্যা ছাড়া, টানা প্রায় ২৯৭০ কেজি কার্বন ডাই অক্সাইড সংযোজন কমানোর ভূমিকা নিতে পেরেছে খোয়াই নগর পঞ্চায়েত ও ত্রিপুরা পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন সংস্থা (ট্রেডা)।

কুড়িবছর টানা কর্মক্ষম থাকার মতো সৌরশক্তির উষ্ণজলের প্ল্যান্ট গুরুত্ব, মান, রোগীর চাপ অনুযায়ী বিভিন্ন হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের ছাদে বসানো হচ্ছে, কুলাই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এখন ধলাই ত্রিপুরা জেলা হাসপাতালে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। গোটা হাসপাতালই নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে নতুন কলেবরে নতুন বাড়িতে স্থানান্তরিত। আর শুরু থেকেই প্রসূতি বিভাগ বা লেবার রুমে পাওয়া যাচ্ছে গরম জল। সেখানে যোগাযোগ করে চিকিৎসক ডা. মৌসুমি দাসের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল ছাদের মাথায় বসানো সৌর শক্তির প্ল্যান্ট থেকে এই গরম জল, শীতের কুয়াশা ঢাকা দিনে সামান্য সমস্যা ছিল এছাড়া নির্বিঘ্নে এই প্ল্যান্ট দিয়েছে এবং দিচ্ছে প্রয়োজনের গরম জল। হিসেব অনুযায়ী ৫০০ লিটারের গরম জল পাওয়ার প্ল্যান্ট বসানোর প্রকল্পে খরচ ৯৩,৫০০ টাকা। এর ফলে প্রচলিত শক্তির তুলনায় ৭০ শতাংশ সাশ্রয়ের অবকাশ জোগাচ্ছে সৌরশক্তি। সাধারণ ওয়াটার হিটারের মাধ্যমে বছরে গড়পড়তা ৫ থেকে ৮ টন কার্বন-ডাই অক্সাইড সংযোজনের আশঙ্কায় ও ৭০ শতাংশ স্বস্তির সুযোগ পাচ্ছে কুলাইতে ধলাই জেলা হাসপাতালটি। দু'তিন মাসে মেরামতির তেমন কোনও প্রয়োজনও দেখা যায়নি বলেই জানা গেল ডাঃ দাসের কাছ থেকে।

বছর দশেক আগে জিরানিয়া ব্লকে ছিল খয়েরপুর ত্রিনাথ সংলগ্ন রাজধরনগর কৃষি এলাকা, পাশেই দেবতাছড়া, খানে খানে সুইসগেট, বাঁধ ইত্যাদির মাধ্যমে এলাকার জমিগুলোতে জলসেচের ব্যবস্থা হয়। দশ বছর আগে এই পরিকল্পনাগুলোতে আজকের অবস্থা ছিল না। সেচের সুবিধা নিয়ে ভাবনা চিন্তার মধ্যেই ট্রেডার পক্ষে স্থানীয় কৃষক জগদীশ দাস, চন্দন দে, সনাতন দে, গৌরাঙ্গ দে-র জন্য বসানো হয় সোলার ইরিগেশন পাম্প। সৌরশক্তির পাম্প চালিয়ে দেবতাছড়ার জল তুলে দেওয়া হবে। সবজি ও অন্য ফসল চাষের জমিতে মোটর মেরামতির প্রয়োজনে শুরুতে ট্রেডার লোকজন এলেও পরে চাষিদের সরাসরি গোর্খাবস্তিতে ট্রেডার অফিস থেকে সারাই করিয়ে আনতে হয়েছে। ২,৯০০০০ টাকার এই প্ল্যান্ট বিনা খরচেই বসিয়েছিলেন ট্রেডা। টানা সাড়ে সাত-আট বছরে ৪-৫ বার প্রয়োজনে মেরামতিও হয় বিনা খরচে। প্রচলিত শক্তির পাম্পে জল তোলার ঘণ্টায় ২০০ টাকা হিসেবে খরচ। দেড় ঘণ্টায় আধাকানি খেত ভাসাতে ৩০০ টাকার শক্তি খরচ। অথচ সৌরশক্তিতে বিনা খরচে তিন ঘণ্টা পাম্প চালিয়ে সমান উপযোগিতার কথা জানান সবজি চাষি চন্দনবাবুই।

চাষিদের সময় করে গোর্খাবস্তির ট্রেডা ভবনে বিকল মোটর সারাই করাতে নিয়ে যাওয়ার সমস্যায় ২০ বছর কর্মক্ষমতার সৌরশক্তিতে জলসেচের পাম্প আট বছর বাদে আপাতত অচল। এ ক্ষেত্রে ট্রেডার জবাব বিনা খরচে সুবিধা ও পরিষেবা পাওয়ায় অভ্যস্ত চাষিরা। স্থানীয়ভাবে মোটর মেরামতির সামান্য উদ্যোগ নিলেই আবার তা চালু হয়ে যায়। নিজেদের খরচ ও শক্তি সাশ্রয়ের দিকটায় যত্ন না নিলে এই অপচয়ের সমস্যার বাইরে আসা যাবে না।

মুঙ্গিয়াকামি ব্লক এলাকা । বড়মুড়া পেরিয়ে ১৮ মুড়া পাহাড়শ্রেণিতে ঢোকার আগে চাকমাঘাটে ব্যারেজ, ইকো পার্ক ইত্যাদির কাছে জাতীয় সড়কের ডান ও বাঁ দিকে বিভিন্ন পঞ্চায়েত। এর মধ্যে সৌরশক্তি সেবিত কয়েকটি গ্রামে ২০০০ এরও বেশি পরিবার। সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এল ডার্লংয়ের কাছে জানা গেল— জাতীয় সড়কের খুব কাছের গ্রাম বাঁ দিকের পূর্ব লক্ষ্মীপুর। দেববর্মা ও রিয়াং উপজাতি অধ্যুষিত ৫০০ পরিবারের বাস। ব্লকের দক্ষিণ গোকুলনগর, নোনাছড়া ও পূর্ব লক্ষ্মীপুর সৌরগ্রাম প্রকল্পে প্রচলিত বিদ্যুৎহীন অবস্থা দূর করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। প্রত্যন্ত গ্রামে বিদ্যুতায়ন প্রকল্পে মডেল টুতে খরচ প্রায় ১৩,১৪৯ টাকা। সরকার থেকে ১১২৫০ টাকা জোগানো হয়। সুবিধাভোগীর খরচ করতে হয় ১৫০০ টাকার মতো।

পূর্বলক্ষ্মীপুরে নুগ্রাই দেববর্মার বাড়ি বাজারের কাছাকাছি। প্রায় পরিবারেই সোলার হোম লাইটিং সিস্টেমে আলোর ব্যবস্থা। প্রত্যেক সোলার প্লেটে দুটো করে লাইট। চারপাশে উঁচু-নীচু টিলা-লুঙ্গা জমি। এমজিএন রেগায় কাটা জলাশয়,

মাছ চাষে উদ্ভাবনী সহায়ক সামগ্রী, জলসেচের পদ্ধতি, রাস্তার পাশের ছোট দোকান, চা-বিস্কুট, নিত্য মুদি সামগ্রীর বিক্রেতা মোমো দেববর্মা, 'সোলার' শব্দটা আলাপচারিতায় বেরিয়ে আসতেই ডেকে দেখালেন, এই দোকানেই সৌরশক্তির দু'দুটো লাইট। টিনের চালে সোলার প্লেট। ভেতরে ব্যাটারি। বলতেই জ্বালিয়ে দেখালেন। জানা গেল, রাত ৮টা /৯টা অবধি দোকান খোলা থাকে। আলো জ্বলে সেই দরকার মতো।

দু'বছর আগে প্রায় ৭০-৮০ শতাংশ বাড়িতেই ব্লকের তত্ত্বাবধানে ট্রেডার পক্ষে সৌর গ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয়। 'সোলার' প্রসঙ্গ নিয়ে কথা উঠতেই মোমো দেববর্মা, রঞ্জিত দেববর্মা ও অন্যরা জানান, 'উজানে' যান বেশ কিছু বাড়িতে পেয়ে যাবেন সোলার লাইট। খানিকটা এগোতেই টিলার মাথায় কয়েকটা বাড়ি। প্রথম বাড়ির উঠোনে হেলান দিয়ে রাখা সোলার প্লেট। বাইরে পায়ের শব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধ। খানিক বাদে হাজির তরুণী মা ও ছোট্ট মেয়ে। বাড়ির মালিক লবচন্দ্র দেববর্মা বাইরে ছিলেন। ছোট্ট মেয়েটিই ঘরে সৌরবাতি জ্বালিয়ে দিল একটি। অপরটি পাশেই অকেজো হয়ে আছে। এই মেয়েটির নার্সারি ক্লাসের পড়া, ঘরোয়া কাজ ইত্যাদি দু'বছর ধরে ভালোই চলছিল। ২/৩ আগে একটা নষ্ট হয়ে যায়। রেশনে লাইন দিয়ে মূল্যবান কেরোসিন তেলের বাতি জ্বালিয়ে আগে কোনও রকমে সন্ধ্যায় কাজ সেরে গোটা গ্রাম নিঝুম হয়ে পড়ত। সৌরশক্তির বাতি সেখানে সন্ধ্যাগুলোকে রাতের দিকে বড় করে দিয়েছে। রাত ৮টা, ৯টা এমনকী ১০টা অবধি জীবন সচল থাকে এখানে। যদিও প্রচলিত বিদ্যুৎ ঢুকে পড়ায় সৌরশক্তির আকর্ষণে কিছুটা ভাটার টান।

এক-দু জন তখন অন্য কথা বাদ দিয়ে আমাদের সোলার অফিস বা এরকমই কোথাও থেকে ভরসা করে অভিযোগ জানাবার মতো কেউ ভেবে কত কিছু আবদার অভিযোগ, দুঃখের কথা বলতে লাগলেন অনর্গল। পৌঁছে গেলাম দণ্ডরাম রিয়াংয়ের দোকানের সামনে। দণ্ডরামবাবুর ঘরের ভেতর দুটো সৌরবাতি, বেশি চার্জ না থাকায় একটা টিমটিম করছে। আর একটায় আলোই নেই। মেয়ে বাসন্তী রিয়াং ও লিলুরাম রিয়াং দু'জনেই নবম শ্রেণির পড়ুয়া। বিডিও অফিসের সামনে মগবাড়ি মেথরাই রিয়াং হাইস্কুলে পড়ে। বোনের সঙ্গে দু'একটা কথাই বলা গেল। আর পাঁচটা ঘরোয়া উপজাতি কিশোরীর মতো জড়সড় ভাব। দাদা আবার ছটফটে। জানাল, আগে মোম-হারিকেনে সন্ধ্যার সময় কোনও রকমে সবাই মিলে কাজ চলত। সোলার লাইটে অনেক ভালো হয়েছে। ওদের বাড়িতেও বছর দুয়েক আগে পঞ্চায়েতের বাকি ঘরের মতোই সৌরশক্তির আলোর ব্যবস্থা হয়, পড়াশোনা থেকে ঘরের অন্য কাজও ভালোভাবে চলত। ওদের সঙ্গে কথার মাঝেই প্রায় মাঝ বয়সি দণ্ডরাম বাবু ঢুকলেন। কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কৃষক তো, জমি দেখতে গিয়েছিলেন। আবার বাড়ির সামনে দোকান। জানালেন, এদিকে বিদ্যুতের লাইন এলেও লম্বা সময়ের লোডশেডিং, লো ভোল্টেজ টিমটিম আলো খুবই বিরক্তির। সৌরবাতি ঠিকভাবে চার্জ হলে রাত ৯টা-১০টা অবধি নিশ্চিন্তে কাজকর্ম চলে। বর্তমানে সোলার লাইট অনেকগুলোই নষ্ট হয়ে পড়ে আছে ঘরে ঘরে। ব্লক থেকে ঠিক করানোর লোক ছিল। বহুকুমার দেববর্মা নাম, কিন্তু ছেলেমেয়ে মিলিয়ে পরিবারে অনেক মুখ। এই কাজে আয় কম, মজুরি কম, সংসার চলে না। তাই আগ্রহ নেই সারাইয়ের কাজে, দণ্ডবাবু ও ঘরে উপস্থিত অন্যরা তো লাইটগুলো ঠিক হওয়ার স্বার্থে বহুকুমারের মজুরি বাড়ানোর দাবিও করে বসলেন।

আরও উজানের দিকে ক্ষীরোদ নায়েকপাড়া এসবি স্কুল পেরিয়ে জোড়া জলাশয়ের মাঝখানের পথটা দিয়ে উপজাতি কিশোর লিলুরামের সঙ্গে হাজির এমজিএন রেগার শ্রমিক দম্পতি ধনরাম ও বিরলা দেববর্মার বাড়ি। দু'জনেরই দশম মান অবধি পড়াশোনা। উগ্রপন্থার কঠিন সময়ে আঠারোমুড়া পাহাড়শ্রেণির আরও গভীরে উত্তর মহরমপুর থেকে ভিটেমাটি ছাড়া। বিরলা দেবীর শ্বশুর উগ্রবাদীদের হাতে নিহত। তাই বাপের বাড়িতে পাকাপাকিভাবে স্বামী আর ছোট মেয়ে অন্বেষা। এখানেও একটা ইউনিট দুটো বাতি। ঘরে একটা মেয়ের নার্সারি পড়া চলে। বারান্দার কোণায় উঠোন দেখা যায় মতো জায়গায় আর একটা লাগানো। ছেলে স্কুলের হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করছে।

৬/৭বছর ধরে এখানে এই টিলার মাথায় জীবন সংগ্রাম চলছে। গৃহস্থালির কাজ, এমজিএন রেগার কাজের সুযোগের মাঝে দু'বছর আগে পর্যন্ত পুরো গ্রামের মতোই সন্ধে ৬/৭টাতে ঘুমিয়ে পড়ত এই পরিবারও। সৌরশক্তির আলো সেই সময়টাকেই বাড়িয়ে রাত ১০টায় দাঁড়া করিয়েছে। তবে প্রচলিত বিদ্যুতের আলোয় লোডশেডিং ছাড়া অন্য সময়ে কিছুটা তো গৌণ করেছেই। তবে সুচেতনতার ধারায় প্রচলিত শক্তির ভাণ্ডারে টান পড়া ও সেগুলোর উৎপাদন ও ব্যবহারে নিয়মিত কার্বন নির্গমনে ভুবন উষ্ণায়নে পরিবেশের মর্জি মেজাজ পাল্টানোর বিষয়গুলো কিন্তু সাধারণের চোখে গুরুতরভাবেই পড়ছে।

সৌরশক্তির উপযোগিতার নজির হিসেবে খোয়াই সবজি বাজারে দীর্ঘ দশবছরে সুবিধাপ্রাপ্তির পাশাপাশি প্রচলিত শক্তি ও অর্থ সাশ্রয়ের দিকটা যেমন উল্লেখ করতে হয়, উল্লেখের দাবি রাখে প্রায় ৮ বছর পরিষেবা দেওয়া খয়েরপুরের চাষের জমিতে জলসেচের সোলার পাম্পও। সমস্যা হচ্ছে, এত খরচের সোলার প্ল্যান্ট যখন সচেতনতার অভাবে মেরামতির সুযোগ না থাকায় মুখ থুবড়ে শক্তির অপচয় করে। একই ছবি গ্রামীণ সৌর বিদ্যুতায়নের সুবিধা পাওয়া পূর্ব লক্ষ্মীপুরেও। সৌরশক্তির উপযোগিতা উপলব্ধি করেও নষ্ট হওয়ার পর আর মেরামতির তৎপরতা না থাকা নিঃসন্দেহে শক্তি অপচয়ের উদ্বেগ জাগায়।

নয়াদিল্লির সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট এর ফেলোশিপ নিয়ে গবেষণার অন্তর্গত পর্যবেক্ষণ থেকে এই প্রতিবেদন।